The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 355-372, ISSN 2306-3920

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন নাট্যচর্চা

ফাহিম মালেক*

[**সার-সংক্ষেপ:** হাজার বছরের বাংলা নাট্যচর্চা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে আপন কক্ষপথ চ্যুত হয়ে আধুনিক থিয়েটার অভিধায় যে বাঁক পরিবর্তন করেছিল, বঙ্গীয় পূর্বাঞ্চলের নাট্যক্রিয়া সে প্রাণ বাঁচিয়ে আপন সত্তায় তা বজায় রেখেছিল দীর্ঘদিন। বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটারের যে চর্চা পরিলক্ষিত হয় তা স্বাধীনতা পরবর্তী। ১৯৪৭ এর দেশভাগ দুটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ড সৃষ্টি করলেও পাকিস্তানি নব্য উপনিবেশ এ দেশে থিয়েটার চর্চার বড়ো অন্তরায় ছিল। আধুনিক থিয়েটার অভিধায় বাংলা নাট্যের যে প্রচলন তা পূর্ব বাংলার নিজস্ব কোনো কৃতি নয় বরং তা কোলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা নাট্যচর্চারই অনুকৃতি মাত্র। যতটা স্বাতন্ত্র্য তার প্রেক্ষিত হিসেবে বলা যায়- বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনই নাটককে প্রোসেনিয়ামের চার দেয়ালের বাইরে রাস্তায়-সভামঞ্চে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ভূমিতে জনতার সন্মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে উত্তাল মার্চের গণআন্দোলন এমনকি মুক্তিযুদ্ধচলাকালীনও এই চর্চা চলমান ছিল। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটক থিয়েটার অভিধায় যে প্রবল প্রতিপত্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে তাতে মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব ও যুদ্ধকালীন নাট্যচর্চার ইতিহাস চলে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সংগীত, ক্রিয়া যেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত, নাট্যচর্চা ঠিক ততটাই রয়ে গেছে প্রদীপের নীচের অন্ধকারে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং অন্যান্য নাট্যগবেষণায় এসবের উল্লেখ ছাড়া এ বিষয়ে প্রামাণ্যের উপস্থিতিও দুর্লভ। তবে আশার কথা এই যে, এ সকল নাট্যকৃতির অনেক কীর্তিমান আজও জীবিত রয়েছেন। পাশাপাশি বিচ্ছিন্নভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য এবং যেসকল সাংস্কৃতিককর্মী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এখনও ইতিহাসের এই অনুন্মোচিত অধ্যায় নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। বলা যেতে পারে বক্ষ্যমাণ গবেষণা তারই প্রাথমিক ভিত্তি।]

* **ফাহিম মালেক :** প্রভাষক, নাটক ও নাট্যত্ত্ব বিভাগ, জাগ্ঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১.

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়। ১৯৪৭ এর দেশভাগ, রাজনীতি, ভূখণ্ড, ধর্ম, নেতৃত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিভাজনের রেখা টানলেও বাঙালি সংস্কৃতির বিভাজন টানতে পারে নি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, দমন-পীড়ন কোনোভাবেই বাঙালি সংস্কৃতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি। ভাষার উপর প্রথম আঘাত আসে দেশভাগের পরই। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা প্রতিষ্ঠা বাঙালির নাট্যচর্চায় এক নবপ্রাণের সঞ্চার করেছিল। ভাষা আন্দোলন নিয়ে জেলখানায় লেখা এবং সেখানেই মঞ্চস্থ করা নাটক 'কবর' সহায়তা করেছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণের প্রতিবাদে নাটককে এক শক্তিশালী মাধ্যমরূপে প্রতিষ্টা করতে। পরবর্তীকালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, ছাত্রদের ১১ দফা, ৬ দফা এবং '৬৯ এর গণআন্দোলন প্রতিটি সংগ্রামে নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে। বক্ষ্যমাণ গবেষণার সুবিধার জন্য বাঙালির এ সকল স্বাধিকার আন্দোলন এবং তার সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্মিলন আলোচনার দাবি রাখে। '৪৭ সালের দেশভাগের পর দুই বাংলায় নাটক মঞ্চায়নের ইতিহাস রয়েছে। তবে পশ্চিম বাংলায় নাটক মঞ্চায়নের ইতিহাস যতটা সমৃদ্ধ পূর্ব বাংলার নাট্যচর্চা ঠিক ততটাই অনুজ্জ্বল। ১৯৪৭ এর আগে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি বা নাট্যচর্চায় হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালিদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ এর দেশভাগ এর পূর্ব এবং পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অন্যান্য কারণে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পরিবার দেশত্যাগের কারণে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক প্রকার শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

পূর্ববঙ্গ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে, কিন্তু ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তা পরিণত হয় পাকিস্তানী শাসন-শোষণের এক নব্য ঔপনিবেশে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গে নাট্য-আন্দোলন খুব একটা গড়ে ওঠেনি। সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক রাজনৈতিক দাবানল জ্বলে উঠলেও পূর্ববঙ্গে নাটককে প্রতিবাদের ভাষারূপে ব্যবহার করে কোনো সুসংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি। প্রকৃত অর্থে, দেশভাগের পর সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতার স্বাদ অর্জন করতে পারেনি পূর্ববঙ্গ। বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে নাট্য-আন্দোলন গড়ে না উঠবার নেপথ্যের কারণ নির্ণয়ে অনেক নাট্যব্যক্তিত্বই ভেবেছেন ভিন্ন ভিন্নভাবে। এ সম্পর্কে নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের বক্তব্য উল্লেখ্য:

> পরাধীন জাতির নাটক হয় না; স্বাধীনতা নাম মাত্র হলেও না; যে জাতি রক্তের ভেতরে স্বাধীনতা অনুভব করতে পারে না সে জাতি হয়তো সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে বা সঙ্গীতে বড় মাপের কিছু সৃষ্টি করতে পারে, নাটক তার কাছে অধরাই থেকে যায়। শিল্পীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে তার পক্ষে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা

> সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পূর্বে শিল্পীর কথা বলার স্বাধীনতা ছিলো না বলেই নাটক বেড়ে উঠতে পারেনি। (চৌধুরী, ২০০৭ : ২২২)

একই প্রসঙ্গে নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও নাট্য-সংগঠক আবদুল্লাহ আল-মামুনের বক্তব্য হচ্ছে:

> বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার জন্য আমাদের উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত কালক্ষেপ করতে হয়েছে। স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলেই বহু বছর আগে দেখা নাট্য স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করেছে। এ থেকে তাৎক্ষণিক যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহল প্রকৃত নাট্যচর্চার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে মুক্ত পরিবেশ এবং স্বাধীন মঞ্চ। শৃঙ্খলিত পরাধীন জাতির আত্মায়-শরীরে নাটক তার নীড় রচনা করতে পারে না। (চৌধুরী, ২০০৭: ২২২)

নাট্যজন আলী যাকেরের ভাষায়:

> আজকের নাট্য দর্শক এবং নাট্যকর্মী পরাধীন দেশে ছিলো নিজ বাসভূমে পরবাসী। প্রতি মুহূর্তেই তাকে বলা হত রাষ্ট্রদ্রোহী, বেঈমান, দুষ্কৃতিকারী। স্বাধীনতা তাকে দিয়েছে বৃহত্তর শিল্পবোধ যে বোধ-এর বাস্তবায়ন আমরা দেখি আজকের মঞ্চ প্রক্রিয়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতা ছিলো না বলেই এখানে নাটক গড়ে উঠতে পারেনি। (চৌধুরী, ২০০৭: ২২৩)

নাট্যসমালোচক মফিদুল হকের ভাষায়:

> স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলাদেশে পাকিস্তানি চেতনা ও ভাবাদর্শ দ্বারা যে শিল্পধারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটা নাটক। (চৌধুরী, ২০০৭: ২২৩)

বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যজনদের অভিমত, স্বাধীনতার আগে নাটক এবং অন্যান্য শিল্পচর্চার কোনো পরিবেশ ছিল না। তাই নাট্যচর্চার গতি ছিল খুবই মন্থর। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতিচর্চা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ পরিসরেই চলে। তবে এ সময় পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চায় দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকাকেন্দ্রিক নাট্যচর্চা এবং অপরটি জেলা পর্যায়ের নাট্যচর্চা (বিশ্বাস, ১৯৮৮: ৫২)। এ সময়ের মধ্যে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নাটক মঞ্চায়নের বেশকিছু নমুনা পাওয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ১৮ মার্চ কার্জন হলে মঞ্চায়িত হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিন্দুর ছেলে' এবং ৩ এপ্রিল মঞ্চায়িত হয় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিংশ শতাব্দী' নাটক (বিশ্বাস, ১৯৮৮: ৫৩)। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে এবং ঢাকার বাইরে নিয়মিতভাবেই নাটক মঞ্চস্থ হয়। তবে পাকিস্তানি সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতির

ভাবধারার সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় নাট্যচর্চার সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা তৈরি হয়নি; যা কিছু চর্চা হয়েছে তা কেবল পূর্বের প্রচলিত নাটকের পুনরাবৃত্তি।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন কেবল নাটক নয় বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক নবপ্রাণের সঞ্চার করে। বাঙালি তার আপন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় নতুন করে ভাবতে শুরু করে। তবে, সাহিত্য-সংগীতে ভাষা আন্দোলন যে নব রসদের জোগান দিয়েছিল সেই একই রসদে নাট্যাঙ্গন তার আপন ভূমিকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। পাকিস্তানি বাধা বিপত্তির পাশাপাশি প্রতিভাবান নাট্যকারের অভাবও এ ক্ষেত্রে সমভাবে দায়ী। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর জেলে বসে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকটি একটি প্রতিবাদী নাট্যধারার সূচনা করলেও নাট্য-আন্দোলনে তা তেমন কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। জাতীয় নাট্যমঞ্চের অভাব, সামরিক শাসন, প্রবল সরকারি বাধা প্রভৃতি নানান কারণেই বাংলা নাটক মঞ্চের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারেনি।

১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নাটক মঞ্চায়নের পরিকল্পনা করেন রাজবন্দি রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁর অনুরোধে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য কারারুদ্ধ মুনীর চৌধুরী ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি রচনা করেন 'কবর' নাটক এবং কারাগারের রাজবন্দিদের অংশগ্রহণে ২১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় কারাগারে মঞ্চস্থ হয় নাটকটি। 'কবর' নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন শ্রী ফণী চক্রবর্তী। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন নলিনী, অজয় রায় ও ধনঞ্জয় দাশ (বিশ্বাস, ১৯৮৮: ১০৮)।

১৯৫৪ সালের তথ্যানুযায়ী ঢাকা শহরে মঞ্চায়িত নাটকের অধিকাংশই ছিল সামাজিক। তবে এই সামাজিক নাটকের মধ্যে সীমিত হলেও সমকালীন সমাজ ও জীবনস্পর্শী কিছু নাটকের মঞ্চায়নও লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল নাট্যোৎসাহী শিক্ষার্থীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ড্রামা সার্কেল' নামে নাট্য সংগঠন। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও বিভিন্ন সময়ে 'ড্রামা সার্কেল' মঞ্চায়ন করে উল্লেখযোগ্য কিছু নাটক। ১৯৬১ সালের মে মাসে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে যখন বাধা আসে তখন বিরুদ্ধ শক্তিকে ভয় না পেয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজনে 'ড্রামা সার্কেল' মঞ্চায়ন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী' নাটক। এর কিছুদিন পর ১৯৬১ সালের জুন মাসে মঞ্চায়িত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক 'তাসের দেশ' ও 'রক্তকরবী' (বিশ্বাস, ১৯৮৮: ১০৮)। নাটক নিয়ে 'ড্রামা সার্কেলে'র পরিকল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সাথে আলোচনা করে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের জন্য নকশা ও প্রাতিষ্ঠান গঠন পরিকল্পনা করেন এবং রমনা পার্কে এই রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের স্থানও নির্ধারিত করে 'ড্রামা সার্কেল' (চৌধুরী, ২০০৭: ২৩২)। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এই পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যায়। তবে 'ড্রামা সার্কেল' নাট্যকর্ম বন্ধ রাখেনি। বছরের বিভিন্ন সময়ে তারা নাটক মঞ্চায়ন করেছে। ১৯৫৯ সালে ঢাকা ইউসিস অডিটোরিয়ামে 'সবাই আমার ছেলে';

১৯৬২ সালে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর', ১৯৬২ সালে ঢাকা ইউসিস অডিটোরিয়ামে সাঈদ আহমদের 'দ্য থিং' অবলম্বনে 'কালবেলা'সহ অনেক নাট্যপ্রযোজনা মঞ্চে আনে 'ড্রামা সার্কেল' (চৌধুরী, ২০০৭: ২১৩)।

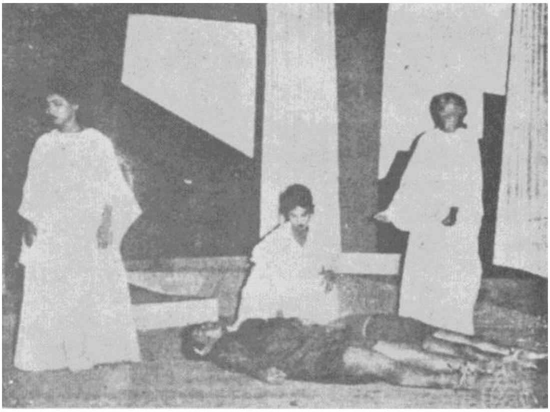

চিত্র ১ : ড্রামা সার্কল প্রযোজিত 'সপ্ত শূরের থীবি আক্রমণ' নাটকের দৃশ্য।

শুধু ড্রামা সার্কেলই নয়, তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন নাট্যদলের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নাটক মঞ্চায়নের ইতিহাস আছে যা দৈনিক পত্র-পত্রিকার তথ্যানুযায়ী উল্লেখ করা যেতে পারে। দৈনিক ইত্তেফাকের তথ্যানুযায়ী, ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ মঞ্চস্থ করে 'আজকাল' এবং ইডেন কলেজ ছাত্রী ইউনিয়ন মঞ্চায়ন করে 'ভাড়াটে চাই' নাটক। আবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মঞ্চস্থ করে আসকার ইবনে শাইখের 'শেষ অধ্যায়' নাটক (চৌধুরী, ২০০৭: ১৬৮)। ১৯৬৮ সালে নার্সিং স্কুল ছাত্রী সংসদ মঞ্চায়িত করে 'কুয়াশা কান্না', ফাল্গুনী সংসদ মঞ্চস্থ করে সামাজিক নাটক 'বারঘণ্টা'। ওয়াপদা সংস্কৃতি সংসদ মঞ্চরূপ দেয় সামাজিক নাটক অনুবর্তন। সিদ্ধেশ্বরী সংস্কৃতি সংসদ মঞ্চস্থ করে সামাজিক নাটক 'পাকা রাস্তা' (চৌধুরী, ২০০৭: ২৯৪)। জাগরণী ক্লাব মঞ্চায়িত করে সামাজিক নাটক 'চোরা গলি মন'। ক্রিসেন্ট ক্লাব মঞ্চস্থ করে 'ফিরোজ শাহ'। এছাড়াও অন্যান্য সংগঠন নাট্যচর্চা অব্যাহত রাখে (চৌধুরী, ২০০৭: ১৭৬)।

১৯৬৮ সালে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে একত্রিত হওয়ার প্রয়াস পায়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাবনা বাঙালির মধ্যে উজ্জীবিত হতে থাকে এবং ক্রমেই একটি আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। রাজনৈতিক আন্দোলন ধীরে ধীরে যখন দানা বাঁধতে শুরু করে তখন সেখানে কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও সামিল হন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সালে নাট্যমঞ্চায়নের

প্রয়াস খুব একটা না থাকলেও নাট্যাঙ্গনের উন্নয়নে সকলের নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর নাটক আর শুধুমাত্র চার দেয়ালের আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নাটক নেমে আসে রাজপথে, মিছিলে। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর প্রাগ্রসর নাট্যব্যক্তিত্বগণ আত্ম-ইতিহাস সংস্কৃতি উপস্থাপনে অধিক যত্নশীল হন। পূর্ব বাংলার থিয়েটারকে পূর্ণাবয়ব দিতে নাট্যচর্চার প্রাণবন্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে অনেকেই গোষ্ঠী বা দল গঠনের প্রতি আগ্রহী হয়। ১৯৬৮-১৯৭১ কাল পরিসরে নাট্যমঞ্চায়নের অঙ্গীকার নিয়ে বেশকিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলি হলো: 'নাট্য সম্প্রদায়' (১৯৬৮), 'মিলন নাট্য সংসদ' (১৯৬৯), 'গণনাট্য পরিষদ' (১৯৬৯), 'সমকাল নাট্য সম্প্রদায়' (১৯৬৯), 'পারাপার' (১৯৭০), 'রঙ্গরূপ' (১৯৭০), 'তরঙ্গ শিল্পী সংসদ' (১৯৭০), 'এক-দুই-তিন শিল্পী গোষ্ঠী' (১৯৭০) এবং 'ঋতুরঙ্গ' (১৯৭০) প্রভৃতি। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর প্রচেষ্ঠায় তৎকালীন সময়ে ঢাকা ও অন্যান্যা অঞ্চলে নাটক মঞ্চায়ন হয় বলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (চৌধুরী, ২০০৭: ৩০৪)।

১৯৭০ সালে ঢাকা শহরে মঞ্চায়িত হয় অসংখ্য নাটক। 'মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক সাংস্কৃতিক সংসদ' মঞ্চস্থ করে সামাজিক নাটক 'বিশ বছর আগে'। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ' কর্তৃক অভিনীত হয় নাটক 'রক্তকরবী'। 'উন্মেষ সাহিত্য সংসদ' মঞ্চস্থ করে 'মহাবিপ্লবের পদধ্বনি'। 'ধ্রুপদী গোষ্ঠী' মঞ্চরূপ দেয় 'কবর' এবং 'পলাতক'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ' মঞ্চস্থ করে সামাজিক নাটক 'বিদ্রোহী পদ্মা'। 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ' মঞ্চরূপ দেয় সামাজিক নাটক 'বৌদির বিয়ে'। 'প্রতিবিম্ব' মঞ্চস্থ করে সামাজিক নাটক 'পুতুল নাচ'। 'সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী' মঞ্চস্থ করে সামাজিক নাটক 'মা'। 'সৃজনী সংসদ' মঞ্চরূপ দেয় সামাজিক নাটক 'গাঁয়ের বধূ'। 'এজিইপি ইনস্টিটিউট' মঞ্চায়িত করে 'সাগর সেচা মানিক'। 'সৃজনী লেকক ও শিল্পী গোষ্ঠী' কর্তৃক অভিনীত হয় 'সংকেত'। 'মিনার্ভা থিয়েটার্স' কর্তৃক অভিনীত হয় সামাজিক নাটক 'কালিন্দী'। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ' মঞ্চস্থ করে সামাজিক নাটক 'আবর্ত' (চৌধুরী, ২০০৭: ২৯৬)।

চিত্র ২: ঢাকার মালিবাগে সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে 'পোস্টার' নাটকের দৃশ্য

১৯৭০ সালের বিভিন্ন সময়ে ঢাকার বাইরেও নাটক মঞ্চায়নের তথ্য জানা যায়। তৎকালীন সময়ে দৈনিক সংবাদ ও অন্যান্য সংবাদপত্রে নাটক মঞ্চায়নের খবরও প্রকাশিত হয়।

সিলেটের সুনামগঞ্জে মঞ্চস্থ হয় 'আশার আলো' ও 'কুয়াশা কান্না'। সিলেটের মৌলভীবাজারে মঞ্চায়িত হয় 'এরা কারা'। রাজশাহীতে মঞ্চস্থ হয় 'দুর্নিবার'। সিলেটের কুলাউড়ায় মঞ্চায়িত হয় 'রাত্রিশেষ'। ফরিদপুরে মঞ্চস্থ হয় 'সিএসপি জামাই' ও 'সুপ্রভাত'। সিলেটের ছাতকে মঞ্চায়িত হয় 'পল্লীর মেয়ে' ও 'দায়ী কে?'। ছাতকেই অভিনীত হয় 'কুয়াশা কান্না' ও 'হায়দার আলী'। বগুড়ায় মঞ্চায়িত হয় 'সিরাজউদ্দৌলা'। পাবনায় অভিনীত হয় 'টিপু সুলতান'। সিলেটে মঞ্চস্থ হয় 'শেষ ফল'। যশোরের কেশবপুরে মঞ্চায়িত হয় 'সাগর সেচা মানিক'। সিলেটের কুলাউড়ায় মঞ্চস্থ হয় 'সাজাহান'। চট্টগ্রামে মঞ্চস্থ হয় 'ত্রিরত্ন'। চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে মঞ্চরূপ দেওয়া হয় 'ফেরিওয়ালা'। ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এ মঞ্চস্থ হয় 'সামনের পৃথিবী'। পাবনায়ও মঞ্চায়িত হয় 'সামনের পৃথিবী'। ময়মনসিংহের ইসলামপুরে মঞ্চায়িত হয় 'ডাকাত'। ময়মনসিংহে মঞ্চায়িত হয় 'সাগর সেচা মানিক'। সিলেটের ছাতকে অভিনীত হয় 'আপট্রেন' ও 'একে শূন্য দশ'। দিনাজপুরে মঞ্চরূপ দেয়া হয় 'পুতুল নিয়ে খেলা'।

১৯৭১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পারাপার গোষ্ঠী 'পোস্টার' নাটকটি মঞ্চস্থ করে এবং একই সময়ে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে সামাজিক নাটক 'জীবন তরঙ্গ' (চৌধুরী, ২০০৭: ৩০০) ।

১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত নাটক শুধুমাত্র বিনোদনের বিষয়বস্তু হয়ে থাকেনি বরং বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদী চরিত্র নিয়ে সাধারন মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নানাবিধ সংকটে কিংবা নিপীড়কের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে বারবার। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে বিপ্লবী জাগরণের সৃষ্টি হয় তা দীর্ঘদিনের ধারাবাহিকতার নাট্য আন্দোলনের ফসল। পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে সাধারন মানুষের কথা বলার অধিকার ছিলনা, সেখানে নাটকের মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

২.

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতে পাক হানাদার বাহিনীর ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা অপারেশন সার্চলাইটের পর স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এলেও মূলত ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকেই সমগ্র বাংলায় স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। সংগ্রাম কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে কার্যত সারাদেশেই পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। প্রতিবাদে মুখরিত হয় সমগ্র বাংলা। বিভিন্ন বয়সি মানুষের অদম্য প্রতিরোধে ঘনীভূত হয় আন্দোলন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রগতিশীল মানবতাবাদী

গণতান্ত্রিক চেতনায় লালিত শিল্পী, সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। লেখক, চিত্রশিল্পী ও সংগীত শিল্পীগণ সংগ্রামের সাথে একাত্বতা ঘোষণা করে নানা কর্মসূচি দেন। ১৪ মার্চ লেখক শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে 'কথা শিল্পী সম্প্রদায়' পল্টন ময়দানে কবিতা পাঠ, সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী' ১৫ মার্চ গণসংগীত, সভা ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। উন্মুক্ত ট্রাকে 'শপথ নিলাম' নাটক হাজারীবাগ, বেচারাম দেউরি, মগবাজার ও মালিবাগে অভিনীত হয়। তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদের উদ্যোগে ফার্মগেটের আনোয়ারা উদ্যানে মঞ্চস্থ হয় গণনাট্য 'মুক্তির নেশা' (চৌধুরী, ২০০৭: ২৯৩)। সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী ২৩ মার্চ সকাল দশটায় কমলাপুর রেল স্টেশনে, বিকাল চারটায় মতিঝিলে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বায়তুল মোকাররমে এবং রাত ৮টায় সদরঘাট টার্মিনালে কবিতাপাঠ, গণসংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে (চৌধুরী, ২০০৭: ২৯৪)।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ সৈয়দ হাসান ইমামকে আহ্বায়ক করে বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীদের একত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই সংগঠনের সাথে অন্যান্য যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন: ওয়াহিদুল হক, আতিকুল ইসলাম, সনজিদা খাতুন, খান আতাউর রহমান, কামরুল হাসান, গোলাম মোস্তফা, কলিম শরাফী, কমল সিদ্দিকী, আমানুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ এস এম সোলায়মান রচিত পথনাটক 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য' সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বাহাদুর শাহ পার্ক, মৌচাক, নিউমার্কেট, সদরঘাটসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সৈয়দ হাসান ইমাম।

চিত্র ৩ : সৈয়দ হাসান ইমাম

এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন ইনামুল হক, আবদুস সাত্তার, মেজবাহ, দিলীপ চক্রবর্তী, মোজাম্মেল হোসেন, ফখরুল আলম বৈরাগী, লতিফ, সোলায়মান হোসেন প্রমুখ (চৌধুরী, ২০০৭: ২৯৭)। এই নাটকের অন্যতম অভিনেতা ছিলেন ড. ইনামুল হক। তখন তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর রসায়ন বিভাগের শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় ১২/এ ছিল তার আবাসস্থল। তৎকালীন সময়ের সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে এই বাড়িটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল।

সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষদের পদচারণায় মুখরিত ছিল এই বাড়ি। চলচ্চিত্র অভিনেতা আনোয়ার হোসেন, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ হাসান ইমাম, আলতাফ হোসেন, টিভি নাট্যব্যক্তিত্ব মাসুদ আলী খান, জিয়া হায়দার, সংগীতশিল্পী অজিত রায়, মাহমুদুর রহমান বেনু, গোলাম রব্বানীসহ অনেকেই ছিলেন এ আড্ডার সারথি। মূলত এই বাড়ি থেকেই সংগঠন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়।

চিত্র ৪ : ইনামুল হক

স্বদেশ ভূমি রক্ষায় কিভাবে সংস্কৃতির সাথে যুক্ত মানুষদের একত্রিত করার পরিকল্পনা, অনুষ্ঠান আয়োজনের স্থান নির্বাচন, নাটকের মহড়া থেকে শুরু কওে সকল কাজে ইনামুল হকের বিশেষ অবদান রয়েছে। তার ভাষায়,

> স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠায় কিছু একটা করতে হবে এমন একটা তাগিদ নিয়েই যুক্ত ছিলাম নাটকে। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে অভিনয় করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে কাজটি খুব সহজ ছিল না আমার জন্য। তারপরও দেশের স্বাধীনতার

> জন্য এটি করতে হয়েছে আমাদের। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নব্য বিবাহিত। পরিবারের ভবিষ্যৎ কিংবা চাকুরি কোনোকিছুই তখন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। (হক, ২০১৯ : সাক্ষাৎকার)

'বিক্ষুদ্ধ শিল্পী সমাজ' দলটির সাথে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন সাংবাদিক শুভ রহমান। মার্চের সেই উত্তাল সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে নাটক প্রদর্শনীর সেই অভিজ্ঞতা এখনও আলোড়িত করে তাকে। তাঁর ভাষায়:

> একাত্তরের একেবারে আগে ২৩ মার্চ সারাদিন ভোর থেকে রাত সারে এগারোটা পর্যন্ত আমরা ঢাকা শহরের একেবারে রেল স্টেশন, সদরঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল সব জায়গায় আমরা কভার করি। আমরা একটা ট্রাকের উপর এই অভিনয় করি। সে নাটকটার নাম ছিল 'রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য'। এতবেশি আবেদন ছিল এই নাটকে যে, মানুষকে দেখেছি নাটক দেখে একসাথে স্লোগান দিতে, অশ্রু বিসর্জন করতে। কুশিলবদের অভিনয় দেখে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে সবাই। (রহমান,২০১৮ : সাক্ষাৎকার)

চিত্র ৫: শুভ রহমান

সৈয়দ হাসান ইমাম নির্দেশিত বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের আরও একটি পথ নাটক 'ভোরের স্বপ্ন' কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, বাহাদুর শাহ পার্ক, নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে অভিনয় করেন গোলাম মোস্তফা, গোলাম রব্বানী, রাজু আহমেদ, আলতাফ হোসেন, ইনামুল হক প্রমুখ (চৌধুরী, ২০০৭: ২৯৮)। 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' এর এই নাট্যপ্রয়াস তৎকালীন সময়ে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে

যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল তা এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্তরূপে বাংলাদেশের নাট্য ইতিহাসে এখনও বিদ্যমান।

চিত্র ৬: ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মঞ্চায়িত 'ভোরের স্বপ্ন' নাটকের দৃশ্য।

এসব তথ্যের নির্যাস এটিই প্রতীয়মান করে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন ঢাকার ক্রিয়াশীল প্রায় সকল নাট্য এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনই নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে নাটককে ব্যবহার করেছে। এসব নাটক স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনায় যেমন ভূমিকা রেখেছে, তেমনি জনগণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধও করেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তুও তা কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলন রূপে বা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি।

সংস্কৃতিকর্মীদের এই নাট্যপ্রচেষ্টা কেবল ঢাকায় নয়, ঢাকার সীমানা পেরিয়ে তা দেশের বিভিন্ন জেলাতেও সক্রিয় ছিল। চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাটক মঞ্চায়নের দৃষ্টান্ত মেলে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর ১৫ মার্চ চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অভিনীত হয় মমতাজউদ্দিন আহমেদ রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তার কিছুদিন পর ২৫ মার্চ বাঙালির জীবনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর

অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসার ঠিক আগের দিন ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম কলেজ মাঠে মঞ্চস্থ হয় মমতাজউদ্দিন আহমেদের নাটক 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটক সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার ছিল নাটক, খোলা মাঠে উদোম মঞ্চে স্বাধীনতার নাটক। (হাসান, ২০১৮ : সাক্ষাতকার)

চিত্র ৭: 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাটকে নির্দেশকের ভূমিকায় মমতাজউদ্দিন আহমেদ

মমতাজউদ্দিন আহমেদের এই কথার মাধ্যমে একজন নাট্যকর্মীর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বদেশপ্রীতির চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই স্বাধীনতার নাটক লিখেছেন এবং তা মঞ্চস্থ করেছেন। একাত্তর সাল এবং তার পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির ওপর পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও নির্যাতনে তিনি ব্যথিত ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই যুদ্ধের মধ্যেও নাটক রচনা ও তা মঞ্চস্থ করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসী ছিলেন তিনি। তার এই উদ্দ্যোগ ছিল সংস্কৃতিকর্মীদের একত্রিত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক অভিনব প্রয়াস।

মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়কালে চট্টগ্রামের পাশাপাশি সিলেটের নাট্যাঙ্গনও ছিল সক্রিয়। ২৫ মার্চ রাতে সিলেটের কয়েকজন নাট্যকর্মী এবং কুমিল্লার কয়েকজন মিলে এই নাটক মঞ্চস্থ করেন। নিজাম উদ্দিন লস্করের নির্দেশনায় এতে অভিনয় করেন বিদ্যুৎ কর, মানসী বিশ্বাসসহ আরও অনেকে। ২৫ মার্চ রাতে সিলেট শহরের অদূরে একটি গ্রামে মঞ্চস্থ করেন নাটকটি। প্রায় ৩০জন নাট্যশিল্পী এই নাটকে অংশগ্রহণ

করেন। সিলেটে তৎকালীন সময়ে যারা নাট্যসংস্কৃতির সাথে জড়িত অধিকাংশই ছিলেন এই দলে। নাটকের নির্দেশক নিজাম উদ্দিন লস্কর সাক্ষাৎকারে দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, সিলেট শহর থেকে একটি দল নিয়ে শহরের একটু দূরে নাটক প্রদর্শনীতে যান। নাটক মঞ্চায়নের কিছু আগে রাত ১২টার পর লোকমুখে জানতে পারেন ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর মাধ্যমে সংগঠিত নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কথা। সংবাদটি শুনে নাটক বন্ধ করে সিলেট শহরের দিকে যাত্রা করেন।

চিত্র ৮: নিজাম উদ্দিন লস্কর

১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগে কুমিল্লা টাউন হল-এ নাটক মঞ্চায়নের ইতিহাস রয়েছে। অর্থাৎ কেবল ঢাকায় নয়, মুক্তিযুদ্ধোত্তর গণ আন্দোলন এবং প্রতিটি সংগ্রামে সারাদেশেই সাংস্কৃতিক কর্মীরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গণ সংগীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নাটককেও বেছে নিয়েছেন সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে।

একাত্তর সালের ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাকাণ্ড শুরু হলে জনজীবন প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্থবির হয়ে পড়ে। হানাদার বাহিনী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গিয়ে নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা করে। শত্রুপক্ষের আক্রমণে মাতৃভূমি যখন বিপন্ন তখন সশস্ত্র প্রতিবাদ ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। তাই স্বদেশ ভূমির রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের ডাকে সাড়া দেয় দেশের নানা বয়সি মানুষ। জনযুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে যোদ্ধাদের পাশাপাশি শিল্পী, খেলোয়াড় আর সৃজনশীল মানুষদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের আগুনও মিশে ছিল। স্বাধীন বাংলা বেতারের শব্দ সৈনিক, স্বাধীন বাংলা

ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের মতো করে শিল্পের নানা অঙ্গনের সৃজনশীল মানুষও ছিলেন সেই যুদ্ধের ময়দানে। মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে নাটক যেমন প্রতিবাদের বিশেষ হাতিয়ার হয়ে ওঠেছিল, ২৫ মার্চের পর থেকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে পূর্বের মতো শহরের অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে নাটক মঞ্চায়নও সম্ভব হয়নি। তাই সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার কর্মীরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের পরিবেশিত গান, কবিতা ও প্রতিবাদী নাটক মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী করার পাশাপাশি শাণিত করেছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, মুক্তাঞ্চল ও শরণার্থী শিবিরে মুক্তিবাহিনীর মনোবল জোগাতে শিল্পীরা সংগ্রাম ও স্বাধীনতার গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা ও শরণার্থী শিবিরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গড়ে তোলা হয় 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'। যেখানে যুক্ত ছিলেন স্বপন চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান বেনু, বিপুল ভট্টাচার্য, শারমিন মুর্শেদ, দেবব্রত চৌধুরী, লতা চৌধুরী, দুলাল চন্দ্র শীল, তারেক আলি, নজরুল সংগীত শিল্পী শাহীন সামাদ, ছায়ানটের সনজিদা খাতুনসহ অনেকে (আহমেদ, ২০১৬: বাংলা ট্রিবিউন)। দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকে করে ঘুরে ঘুরে এই সংস্থা সংগীত ও পাপেট শো পরিবেশন করতেন। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা যখনই কোথাও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তখন সে অঞ্চল এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুক্তিপাগল মানুষেরা ছুটে আসতেন গান আর পাপেট শো দেখার জন্য। গান শুনে মুক্তির চেতনায় উজ্জীবিত করার পাশাপাশি পাপেট থিয়েটার সকলকে আনন্দ দিত। রণাঙ্গনে মুক্তিকামী মানুষদের বিনোদন প্রদান এবং উজ্জীবিত রাখার প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রদর্শিত হতো এই পাপেট শো। দেশের মানুষদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন চরিত্র অনেকটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হতো পাপেটে। সব বয়সি মানুষের কাছে বিশেষ করে শিশুদের কাছে পাপেট ছিল উপভোগ্য একটি বিষয়। পাপেট শো করার আগে স্থানীয়দের মুখে মুক্তিযুদ্ধের তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনে নিত, ইয়াহিয়া কিংবা পাক হানাদারদের সম্পর্কে তারা যা জানে তা বলতো। পরবর্তী সময়ে তাদের বলা কথাগুলোর অংশবিশেষই পাপেট-এর চরিত্রগুলোর মুখে উচ্চারিত হতো। এতে সকলেই খুব আনন্দিত হতো। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কেবল বাংলাদেশেই নয় পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরসহ বিভিন্ন স্থানে নাটক মঞ্চায়নের ইতিহাস আছে। নাট্যকর্মীরা শরণার্থীদের জন্য তহবিল গঠনের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে নাটক মঞ্চায়ন করে।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোলকাতার শরণার্থী শিবিরে মামুনুর রশীদ রচিত 'পশ্চিমের সিঁড়ি' নাটক মঞ্চস্থ হয়। শুধু তহবিল গঠন নয়, ট্রাকে করে পথে পথে ঘুরে নাটকের মাধ্যমে সকলকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাও ছিল প্রধানতম উদ্দেশ্য (দেবনাথ, ২০১৭: দৈনিক জনকণ্ঠ) ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরিবেশিত শ্রুতি নাটকও একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে 'চরম পত্র' অনুষ্ঠানের নাট্যাংশ সে সময় মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। সে অনুষ্ঠানে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশিত নাট্যমূলক পরিবেশনাগুলো দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন গণ নাট্য আন্দোলন এর ঢেউ বৃটিশ ভারতে যেমন প্রভাব ফেলেছিল 'নবনাট্য', 'গণনাট্য' আন্দোলন সৃষ্টিতে তেমনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন নাট্যচর্চাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। স্বতন্ত্র শিরোণামে এ নাট্য আন্দোলন কোন সুনির্দিষ্ট আকার হয়তো লাভ করেনি, শিল্প বিচারেও এসব নাট্য প্রয়াস হয়তো মানোত্তীর্ণ হতে পারেনি। পাণ্ডুলিপি হিসেবে এসবের মানও হয়তো অনুজ্জ্বল। কিন্ত এসকল গণনাট্য প্রয়াস সবসময়ই সমকালীন। তবে তা সমকালের বিচারেই বাহিত হয় চিরকালে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারও তাই এসকল নাট্য প্রয়াসকে সম্মান দেখিয়ে তাদেরকে শব্দ সৈনিক রূপেই কেবল অভিহিত করেননি, দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধার সম্মান। পরাধীন দেশে নাট্যচর্চা বেগবান হয় না এ কথা সত্য হলেও, সংস্কৃতির চেতনাকে কখনো রুদ্ধ করে রাখা যায় না। শত নিষেধের জাল ছিঁড়ে সে আপনি করে নেয় আপনার পথ। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাংলা নাটক তাই আপন পথে আপন মতেই হেঁটেছে। ৭০ এর নির্বাচনে বাঙালির স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগ এক ও অদ্বিতীয় শক্তিরূপে আবির্ভূত হবার মধ্যেই বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশের এক নব যাত্রার ইঙ্গিত পেয়েছে। আর তাই দীর্ঘদিনের রুদ্ধ নাট্যপ্রয়াস প্রতিবাদের রূপ ধরে আবির্ভূত হয়েছে এর অব্যবহিত পরেই। আর সে সময়ে এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন নাট্যপ্রয়াসই এক সুসংহত রূপে স্বাধীন দেশে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে নিঃসন্দেহে।

পরিশিষ্ট

গবেষণার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণ একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এই গবেষণার ক্ষেত্রেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের আগে ও যুদ্ধকালীন সময়ের একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নাট্যনির্দেশক সৈয়দ হাসান ইমাম এবং অভিনেতা, লেখক, নাট্যকার, শিক্ষক ইনামুল হক। নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপনপূর্বক গ্রহণকৃত সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো।

সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ

সৈয়দ হাসান ইমাম

প্রশ্ন : **১৯৭১** সালের সেই সময়ে সংস্কৃতিকর্মীদের কী ভূমিকা ছিল?

উত্তর : শিল্পীদের একটি বিরাট ভূমিকা ছিল মুক্তিযুদ্ধ প্রস্তুতকালে। আমরা সব শিল্পীদের নিয়ে অসাধারণ সব অনুষ্ঠান করেছিলাম। গান করেছিলাম। বিপ্লবের গান, সংগ্রামের গান, দেশের গান করেছি। এই বাংলা একাডেমিতে আমরা সভা করেছি। শহিদ মিনারে আমরা অমর একুশে অনুষ্ঠান করেছি। শ্রমিক এলাকাতে গিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। বিভিন্ন সময় বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে, নারায়ণগঞ্জে গিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। টঙ্গীতে অনুষ্ঠান করেছি। তেজগাঁও শিশুপল্লিতে অনুষ্ঠান করেছি। ছাত্রদের হলের সামনে গিয়ে অনুষ্ঠান করেছি, পথ নাটক করেছি। সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ।

প্রশ্ন : যে নাটকটি ঢাকার বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে তার মূল বিষয়বস্তু কী ছিল?

উত্তর : **১৯৭১** সালের ২৩ মার্চ সোলায়মান রচিত পথনাটকটির নম ছিল ‘রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য’ যা সকাল ৮টা থেকে রাত **১০**টা পর্যন্ত বাহাদুর শাহ পার্ক, মৌচাক, নিউমার্কেট, সদরঘাটসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। এটি ভারতের খাদ্য-আন্দোলনের ওপর লেখা। কিন্তু সেখানে আমরা একটি উপাদান খুঁজে পেয়েছিলাম তা হলো, সেখানে পুলিশকে উৎসাহিত করছে জনগণ। তারা বলছে, তোমরা কেন অন্যায় নির্দেশ মেনে চলবে; তোমরা ওদের দিকে নল ঘুরিয়ে জনতার কাতারে এসে দাঁড়াও। আমরা লক্ষ করলাম যে পুলিশ অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরলো শাসকদের বিরুদ্ধে। ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তি সে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যা আমাদের দারুণভাবে আলোড়িত করেছে তখন।

প্রশ্ন : ২৫ মার্চ রাতেও আপনারা নাটক মঞ্চায়ন করেছেন বলে জেনেছি। সেই দিনের সেই উত্তাল সময়ে আপনার সাথে কে কে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর : ২৫ মার্চের রাত্রে যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলাম সেখানে অনেকেই ছিল আমার সাথে। সেখানে অভিনয় করেছেন গোলাম মোস্তফা, রাজু আহমেদ, ড. ইনামুল হক ও গোলাম রব্বানীসহ অনেকে।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগে যখন সারা বাংলা উত্তাল তখন আপনাদের এই নাট্যপ্রয়াস কেমন সাড়া জাগিয়েছিল?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের ঠিক আগে হলেও আমাদের এই নাটক বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। মানুষের দারুণ উৎসাহ দেখেছিলাম সেদিন। আর তাদের আনন্দে আমরাও উৎসাহিত হয়েছিলাম সেদিন। আর এ কারণেই সারা ঢাকা শহর ঘুরে ঘুরে আমরা নাটকটি মঞ্চায়ন করেছি।

ইনামুল হক

প্রশ্ন : দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে নাটকের সাথে কীভাবে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর : কলেজে থাকা অবস্থায় সংস্কৃতিচর্চায় নিজেকে যুক্ত রেখেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তা আরও পূর্ণতা পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি হল-এ বার্ষিক নাটকের আয়োজন থাকতো যেখানে আমাদের উপস্থিতি থাকতোই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছি। অভিনয়ের জন্য হল-এর ছাত্রদের কাছে খুব জনপ্রিয়ও ছিলাম। এই জনপ্রিয়তার জন্য আমি এ কে ফজলুল হক হল-এর নির্বাচিত সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে পালন করেছি। আমি দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে নিয়মিতভাবে নাটকের আয়োজন থাকতো হল-এ এবং আমি সেই নাটকে অভিনয়ও করেছি।

প্রশ্ন : বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর কর্মজীবনে নাটকের উপস্থিতি কতটা ছিল?

উত্তর : বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর শিক্ষক হিসেবে আমি কর্মজীবন শুরু করি। বুয়েটের রসায়ন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। বলা যায়, এখানে যোগদানের পর থেকে নাট্যচর্চা আমার জীবনে নতুন করে আবির্ভূত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় ১২/এ নম্বর বাসা ছিল আমার আবাসস্থল। তৎকালীন সময়ের সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে এই বাড়িটির বিশেষ একটি তাৎপর্য ছিল। সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষদের পদচারণায় মুখরিত ছিল এই বাড়ি। এখান থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হতো। প্রতিটি পরিকল্পনাতেই একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমি থাকতাম।

প্রশ্ন : তৎকালীন সময়ে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক বিধি নিষেধ ছিল বলেই জানি, এমন একটা সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করাটা একটা সাহসী পদক্ষেপ ছিল। এই পদক্ষেপের পেছনে কী ভাবনা কাজ করেছিল?

উত্তর : স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠায় কিছু একটা করতে হবে এমন একটা তাগিদ নিয়েই যুক্ত ছিলাম নাটকে। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে অভিনয় করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে কাজটি খুব সহজ ছিল না আমার জন্য। তারপরও দেশের স্বাধীনতার জন্য এটি করতে হয়েছে আমাদের। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নব্য বিবাহিত। পরিবারের ভবিষ্যৎ কিংবা চাকুরি কোনোকিছুই তখন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, তানভীর (২০১৬), 'একাত্তরের অনুচ্চারিত কণ্ঠযোদ্ধা মাহমুদুর রহমান বেনু', ১৬ ডিসেম্বর, *বাংলা ট্রিবিউন*।

চৌধুরী, রাহমান (২০০৭), *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

চৌধুরী, শাহজাহান (২০১৩), *কুমিল্লার নাট্যাঙ্গন ও আমি*, প্রতিবিম্ব থিয়েটার প্রকাশনা (সেপ্টেম্বর) ।

ড. ইনামুল হকের নাট্যাঙ্গনে পাঁচ দশক উপলক্ষ্যে 'নৈবিদ্যি আঁখর', সম্পাদনাঃ মাহমুদুল ইসলাম সেলিম, নাগরিক প্রকাশনা, মে ২০০৯।

দেবনাথ, মলয় (২০১৭), 'বিকাশ বাংলা নাটকের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের নাটক', ১৭ মার্চ, *দৈনিক জনকণ্ঠ*।

বিশ্বাস, সুকুমার (১৯৮৮), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হাসান, অনুপম (২০১৩), *ত্রয়ী নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধ ও ব্রাত্যজন কথা*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

[**Abstract** : Thousand years old bengali theatre culture was demoralized by the colonial oppression, but it is still alive by the regional eastern bengali theatre activity.After the liberation war Bangladeshi theatre has its own history. After 1947 geological partition of region, Bengali theatre was oppressed by Pakistani colonialism. But the benglai theatre was not an unique way of culture, it was the imitation of Kolkata bangla drama. Only the individual right revolution of bengal people made the drama to come out from proscenium to the street and ignite protest. Before our liberation war and during the revolution days this practice continued. After the liberation war when bengali drama started a new energetic era in theatre, then previous bangla drama culture based on liberation war was forgotten. Though liberation-based songs and activities are immortal, theatre culture lost its path. But this issue is only being published in newspapers and addressed in drama research, there is no authentic documentation. There is a hope that many devoted people of liberation war-based drama are still alive. We can cherish there expertise, document those cultural people memories who were involved in liberation war to unfold the untold stories of our history. This research is preliminary base of that issue.]